একটি পত্রিকা, একটি প্রভাতের প্রতিশ্রুতি

নবাবী আমলের শেষ সূর্যোদয় হয়েছিল পলাশীর আম্রকাননে— সেটি ছিল এক যুগের অবসানের প্রতীক। সেই সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটি অধ্যায় চিরতরে নিভে যায়। কিন্তু ইতিহাস কখনো শূন্যতায় থেমে থাকে না। সময়ের স্রোত নতুন প্রভাতের জন্ম দেয়।

বহু বছর পর, সেই বাংলার বুকেই আবার সূর্য ওঠে— এবার স্বাধীনতার, আত্মমর্যাদার, জাতিসত্তার সূর্য। সেই সূর্যোদয়ের পুণ্যভূমি মুজিবনগর। মুজিবনগরের আম্রকানন— একটি নাম, একটি স্থান, অথচ তার ভেতরে লুকিয়ে আছে একটি জাতির পুনর্জন্মের ইতিহাস। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল, দগ্ধ-রক্তাক্ত এক সময়ের মধ্যে এখানেই শপথ নেয় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার। সেই শপথ ছিল কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়; ছিল প্রতিজ্ঞা, ছিল সংগ্রামের অঙ্গীকার, ছিল স্বাধীনতার অগ্নিশপথ। যুদ্ধক্ষেত্রে তখন গর্জে উঠছে বন্দুক, চারদিকে অনিশ্চয়তা, তবুও সেই সরকার নেতৃত্ব দিয়েছিল নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধকে— একটি জাতিকে পৌঁছে দিয়েছিল বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে।

মেহেরপুর জেলা— নিরীহ, কৃষিনির্ভর, শান্ত এক জনপদ। এই মাটিতে ধানের শিষ দোলে, কৃষকের ঘামে সিঞ্চিত হয় জীবনের চক্র। কিন্তু এই সরলতার আড়ালেই লুকিয়ে আছে গভীর ইতিহাস, সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগের কাহিনি। এখানকার মানুষ যেমন জমিতে ফসল ফলায়, তেমনি সময়ের প্রয়োজন হলে ইতিহাসও রচনা করে। আর সেই ইতিহাসকে ধরে রাখার, লালন করার এবং নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম— সংবাদপত্র। মেহেরপুর জেলায় সংবাদপত্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল “পরিচয়” দিয়ে। নামের মধ্যেই ছিল এক ধরনের আত্মপরিচয়ের সন্ধান। সেই পত্রিকা ছিল সময়ের দর্পণ, সমাজের ভাষ্যকার। সময় বদলেছে, মাধ্যম বদলেছে, কিন্তু মানুষের কথা বলার প্রয়োজন কখনো বদলায়নি। সেই ধারাবাহিকতায় আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ‘আমাদের সূর্যোদয়’ এবং ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ এই দুই পত্রিকা জেলার মানুষের কথা বলার দায়িত্ব বহন করছে। এর মধ্যে মেহেরপুর প্রতিদিন একটি বিশেষ অবস্থান তৈরি করেছে। ২৬ মার্চ পত্রিকাটি আট বছরপূর্তী। ২৭ মার্চ নয় বছরে পদার্পণ করেছে।

আট বছর— সময়ের হিসাবে হয়তো দীর্ঘ নয়, কিন্তু একটি জেলা-ভিত্তিক পত্রিকার জন্য এটি এক বিশাল অর্জন। কারণ একটি পত্রিকা টিকিয়ে রাখা মানে শুধু ছাপাখানার কালি আর কাগজ নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অর্থনৈতিক সংগ্রাম, পেশাগত চ্যালেঞ্জ, সামাজিক চাপ এবং অনেক সময় রাজনৈতিক প্রতিকূলতাও। একটি পত্রিকা যখন পথচলা শুরু করে, তখন তার সামনে থাকে হাজারো অনিশ্চয়তা। পাঠক পাবে কি না, বিজ্ঞাপন আসবে কি না, সত্য প্রকাশের সাহস ধরে রাখা যাবে কি না— এসব প্রশ্ন প্রতিনিয়ত তাড়া করে। সেই কঠিন বাস্তবতার মধ্যেও মেহেরপুর প্রতিদিন ধীরে ধীরে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। এটি শুধু একটি সংবাদমাধ্যম নয়, বরং একটি আস্থার নাম হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে সংবাদপত্রের ভূমিকা অপরিসীম। আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের পাশাপাশি সংবাদমাধ্যম সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা, দুর্নীতির মুখোশ উন্মোচন করা, সাধারণ মানুষের সমস্যা তুলে ধরা— এসব দায়িত্ব কোনো অংশে কম নয়। বরং অনেক সময় এই দায়িত্বই হয়ে ওঠে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। এই ঝুঁকিপূর্ণ পথেই সাহসিকতার সঙ্গে হেঁটেছে মেহেরপুর প্রতিদিন। জেলার বিভিন্ন সমস্যা, অবহেলিত মানুষের কষ্ট, স্থানীয় প্রশাসনের সীমাবদ্ধতা কিংবা সামাজিক অসঙ্গতি— সবকিছুই তারা তুলে ধরেছে নির্ভীকভাবে। ফলে পত্রিকাটি দ্রুতই হয়ে উঠেছে গণমানুষের মুখপত্র।

একটি পত্রিকার প্রকৃত শক্তি তার পাঠকের মধ্যে। যখন পাঠক বিশ্বাস করে— এই পত্রিকা তার কথা বলবে, তার সমস্যাকে গুরুত্ব দেবে, তখনই সেই পত্রিকা সত্যিকারের শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মেহেরপুর প্রতিদিন সেই বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছে। একটি ছোট্ট গ্রামের কোনো কৃষকের সমস্যা, কোনো শিক্ষার্থীর স্বপ্ন, কোনো নারীর সংগ্রাম— সবকিছুই এই পত্রিকার পাতায় জায়গা পেয়েছে। এটি কেবল সংবাদ পরিবেশন করে না; এটি মানুষের গল্প বলে। কখনো প্রতিবাদের ভাষা হয়ে ওঠে, কখনো আশার আলো জ্বালায়। কোনো একটি প্রতিবেদনের মাধ্যমে যখন প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়, কোনো সমস্যার সমাধান হয়— তখনই একটি পত্রিকার সার্থকতা পূর্ণতা পায়।

তবে এই পথ সহজ ছিল না। অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, অনলাইন মিডিয়ার প্রতিযোগিতা— সবকিছু মোকাবিলা করেই এগিয়ে যেতে হয়েছে। বর্তমান সময়ে সংবাদপত্রের জগতে টিকে থাকা মানেই প্রতিনিয়ত নিজেকে নতুন করে গড়ে তোলা। সেই চ্যালেঞ্জও গ্রহণ করেছে মেহেরপুর প্রতিদিন। ডিজিটাল যুগে যখন তথ্যের বন্যা,

তখন সত্য যাচাই করে নির্ভুল সংবাদ পরিবেশন করা আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। ভুয়া খবরের ভিড়ে সত্যকে আলাদা করে তুলে ধরা— এটি এক ধরনের নৈতিক যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখার চেষ্টা করেছে এই পত্রিকাটি। মেহেরপুরের মানুষ যেমন পরিশ্রমী, তেমনি তাদের মনও উদার। তারা ভালোবাসে নিজের মাটি, নিজের ইতিহাস। সেই ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় একটি পত্রিকা যখন তাদের পাশে দাঁড়ায়, তখন সেটি শুধু একটি প্রতিষ্ঠান থাকে না— এটি হয়ে ওঠে পরিবারের অংশ।

আজ যখন মেহেরপুর প্রতিদিন নবম বছরে পদার্পণ করছে, তখন এটি কেবল একটি বার্ষিকী নয়; এটি একটি যাত্রার মাইলফলক। এই নয় বছর পত্রিকাটিকে শিখিয়েছে কীভাবে প্রতিকূলতার মধ্যে টিকে থাকতে হয়, কীভাবে মানুষের আস্থা অর্জন করতে হয়, কীভাবে সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে হয়। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়—— পলাশীর আম্রকাননে একটি সূর্য অস্ত গিয়েছিল, আর মুজিবনগরের আম্রকাননে আরেকটি সূর্য উদিত হয়েছিল। সেই ধারাবাহিকতায় আজও প্রতিদিন সূর্য ওঠে— সংবাদপত্রের পাতায়, মানুষের কণ্ঠে, সত্যের আলোয়। মেহেরপুর প্রতিদিন সেই আলোরই একটি অংশ। এটি প্রতিদিন নতুন সূর্যোদয়ের বার্তা নিয়ে আসে— সত্যের, সাহসের, ন্যায়বিচারের। আট বছর পার করে এটি প্রমাণ করেছে— ইচ্ছা থাকলে, সাহস থাকলে, দায়বদ্ধতা থাকলে একটি ছোট্ট শহরের পত্রিকাও বড় হয়ে উঠতে পারে মানুষের হৃদয়ে। আগামী দিনের পথ আরও দীর্ঘ, আরও চ্যালেঞ্জিং।

কিন্তু ইতিহাস বলে— যে মাটিতে একবার সূর্য ওঠে, সেই মাটিতে অন্ধকার চিরস্থায়ী হয় না। মেহেরপুরের মাটিও তেমনই। এখানকার প্রতিটি ভোর নতুন সম্ভাবনার বার্তা নিয়ে আসে। আর সেই সম্ভাবনার সঙ্গী হয়ে, মানুষের পাশে থেকে, সত্যের পথে অটল থেকে— মেহেরপুর প্রতিদিন এগিয়ে যাবে আরও অনেক দূর। কারণ, এটি শুধু একটি পত্রিকা নয়— এটি একটি প্রতিশ্রুতি, একটি বিশ্বাস, একটি চলমান সূর্যোদয়।

পূণ্যভূমির শপথ ও প্রতিশ্রুতির

পরীক্ষা

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূণ্যভূমি মুজিবনগর—এই নাম উচ্চারণ করলেই ইতিহাসের এক দীপ্ত অধ্যায় চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেই ইতিহাসের মাটিতে দাঁড়িয়ে ২০২৬ সালের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলাম থেকে নির্বাচিত হয়েছেন বল্লভপুরের সন্তান তাজউদ্দিন খান। দীর্ঘদিন ধরে এ আসনে আওয়ামী লীগ কিংবা বিএনপি প্রার্থীরাই বিজয়ী হয়েছেন। কিন্তু এবার মানুষ ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পরিবর্তন কেবল রাজনৈতিক নয়; এটি প্রত্যাশার পরিবর্তন, আস্থার পরিবর্তন, আর এক অর্থে ক্ষোভেরও প্রকাশ।

‘তাজউদ্দিন’—নামের অর্থ ধর্মের মুকুট, আদর্শের শিরোমণি। নামের এই প্রতীকী ব্যঞ্জনা এখন এক কঠিন পরীক্ষার সামনে। কারণ মেহেরপুরের মানুষ বহুবার ইশতেহার শুনেছে, প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি দেখেছে, কিন্তু বাস্তবায়নের ফল ততটা পায়নি। তাই নতুন এই অধ্যায় শুরু হয়েছে এক নীরব প্রশ্ন নিয়ে—এবার কি সত্যিই বদল আসবে?

মেহেরপুর কৃষিনির্ভর জেলা। এ অঞ্চলের মাটি উর্বর, মানুষ পরিশ্রমী। ধান, গম, ভুট্টা, আলু, পেঁয়াজ, আম—ফসলের বৈচিত্র্যে ভরপুর এই জনপদ। অথচ কৃষক আজও ন্যায্যমূল্য, সার-বীজের সহজ প্রাপ্তি এবং সেচের নিশ্চয়তা নিয়ে অনিশ্চয়তায় থাকে। নির্বাচনের আগে ঘোষণা ছিল—এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি থাকবে না; কৃষক দলীয় পরিচয়ে নয়, চাষের ভিত্তিতে সুবিধা পাবে। এই অঙ্গীকার যদি বাস্তবে রূপ পায়, তবে তা হবে মেহেরপুরের অর্থনীতির ভিত শক্ত করার প্রথম ধাপ। কৃষিকে ঘিরে যদি গড়ে ওঠে সংরক্ষণাগার, প্রক্রিয়াজাত শিল্প ও সহজ বাজারব্যবস্থা, তবে কর্মসংস্থানের নতুন দুয়ার খুলবে।

কিন্তু কৃষির পাশাপাশি আরেকটি অন্ধকার ছায়া আজ গ্রাস করছে জনপদকে—মাদক ও অনলাইন জুয়া। কত পরিবার নিঃস্ব হয়েছে, কত তরুণ হারিয়েছে স্বপ্নের দিশা। মাদকমুক্ত ও জুয়ামুক্ত মেহেরপুর গড়ার প্রতিশ্রুতি কেবল প্রশাসনিক উদ্যোগে নয়, সামাজিক জাগরণেও বাস্তবায়িত হতে পারে। প্রয়োজন কঠোরতা ও সহমর্মিতার সমন্বয়।

শিক্ষার উন্নয়ন নিয়েও উচ্চারণ করা হয়েছে আশাবাদী শব্দ। পাঠনির্ভর শিল্পায়ন, কারিগরি প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিভিত্তিক দক্ষতা—এসব যদি বাস্তবায়িত হয়, তবে তরুণ প্রজন্মের হাতে কর্মসংস্থানের আলো জ্বলবে। কৃষিনির্ভর অর্থনীতির সঙ্গে যদি যুক্ত হয় জ্ঞাননির্ভর

উদ্যোগ, তবে মেহেরপুর হতে পারে এক সম্ভাবনার মডেল জেলা।

যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নও জরুরি। গ্রামীণ সড়ক, বাজার অবকাঠামো ও সংরক্ষণাগার উন্নত না হলে কৃষকের ঘাম সঠিক মূল্য পাবে না। উন্নয়ন মানে কেবল ইট-পাথরের স্থাপনা নয়; উন্নয়ন মানে মানুষের জীবনযাত্রার বাস্তব পরিবর্তন।

মুজিবনগরের মাটি ইতিহাসের সাক্ষী। এই মাটিতে দাঁড়িয়ে দেওয়া প্রতিশ্রুতি তাই সাধারণ কোনো রাজনৈতিক উচ্চারণ নয়—এ এক নৈতিক অঙ্গীকার। নতুন এমপি হিসেবে তাজউদ্দিন খানের সামনে সুযোগ আছে প্রমাণ করার, পরিবর্তন কেবল স্লোগান নয়; এটি কর্মের ধারাবাহিকতা।

অতীতের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে যদি তিনি দলীয় সীমারেখার ঊর্ধ্বে উঠে কৃষক, শিক্ষার্থী, যুবক ও সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ান, তবে এই বিজয় অর্থবহ হবে। অন্যথায় ইতিহাসের পূণ্যভূমিও নীরব সাক্ষী হয়ে থাকবে আরেকটি অপূর্ণ প্রতিশ্রুতির।

মানুষ ভোট দিয়েছে আশা নিয়ে। এখন সময় সেই আশাকে বাস্তবের মাটিতে বপন করার।

প্রতিশ্রুতিগুলো কাগজেই রয়ে গেছে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে মেহেরপুর-মুজিবনগরে আবারও শোনা যাচ্ছে পরিচিত সব প্রতিশ্রুতি, চাকরি, শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও আধুনিক উন্নয়ন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, গত দেড় যুগে এই এলাকার বাস্তবতায় কী বদলেছে, আর কোন প্রতিশ্রুতিগুলো কাগজেই রয়ে গেছে? সরেজমিন বাস্তবতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মেহেরপুর ও মুজিবনগরে দৃশ্যমান উন্নয়ন প্রধানত অবকাঠামোকেন্দ্রিক। সড়ক, ভবন, প্রশাসনিক স্থাপনা ও স্মৃ়সৌধ উন্নয়নের কাজ হয়েছে।

তবে এসব উন্নয়ন স্থানীয় মানুষের আয় ও কর্মসংস্থানে কতটা প্রভাব

ফেলেছে- সেটিই এখন বড় প্রশ্ন। নির্বাচনী ইশতেহার ও সভা-সমাবেশে বারবার শিল্পায়নের কথা বলা হলেও বাস্তবে বড় কোনো শিল্প কারখানা গড়ে ওঠেনি। ফলে শিক্ষিত যুবকদের জন্য বেসরকারি চাকরির সুযোগ খুবই সীমিত। স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা কিছু ছোট ব্যবসা ও দোকান কর্মসংস্থানের সামান্য সুযোগ তৈরি করলেও তা ক্রমবর্ধমান কর্মপ্রত্যাশীদের তুলনায় নগণ্য।

মেহেরপুরের প্রগতিশীল মানুষ মাহবুবুল হক মন্টু বলেন, মেহেরপুরে বিভিন্ন সময়ে রেল লাইন, কৃষি গবেষণা ও কৃষি ইন্সটিটিউট, ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষিভিত্তিক শিল্প, কোল্ড স্টোরেজ বা খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র, মেডিকেল কলেজ গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতির কথা ছিল। কিন্তু পরিকল্পনার অভাব ও উদ্যোগহীনতায় তা হয়নি। অধিকাংশ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় বাইরের ঠিকাদার ও শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া হয়। ফলে স্থানীয় শ্রমজীবী মানুষের জন্য দীর্ঘমেয়াদি কাজের সুযোগ তৈরি হয় না। কাজ শেষ হলে কর্মসংস্থানও শেষ হয়ে যায়। মানুষ এবার যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের কথা বলছেন।

মুজিবনগরের দিনমজুর রমজান আলী বলেন, রাস্তা বানানোর সময় কয়েক মাস কাজ পাই, তারপর আবার বেকার। এতে বোঝা যায়, উন্নয়ন প্রকল্পগুলো কর্মসংস্থানমুখী না হওয়ায় স্থায়ী আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে না।

নারী কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও বাস্তবতা হতাশাজনক। সরকারি প্রশিক্ষণ বা ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম থাকলেও তা পর্যাপ্ত নয়। অধিকাংশ নারী এখনো ঘরকেন্দ্রিক অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমেই সীমাবদ্ধ। সমাজকর্মী তৃপ্তি কনা বিশ্বাসের ভাষায়, নারীদের জন্য আলাদা শিল্প এলাকা, প্রশিক্ষণ ও বাজার সংযোগ ছাড়া টেকসই পরিবর্তন আসবে না। এবারও যারা এসব পরিবর্তণের প্রতিশ্রুতি দেবেন তাদেরকেই চাচ্ছি।

মানবাধিকারকর্মী দিলারা জাহান বলেন, নারীর জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও নিরাপদ কর্মক্ষেত্র ছাড়া উন্নয়ন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

এছাড়া সংখ্যালঘু ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও অধিকার নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে। এই মানবাধিকার কর্মীর মতে, নির্বাচনের সময় সবাই সমতার কথা বললেও বাস্তবে বৈষম্য থেকেই যাচ্ছে। আমরা নারীদের উৎসাহ যোগাচ্ছি যারা কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করবেন তাদেরকে ভোট প্রদানের জন্য।

মুজিবনগরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও পর্যটন ও গবেষণাভিত্তিক কর্মসংস্থান গড়ে ওঠেনি। স্মৃতিসৌধকেন্দ্রিক আয়োজন বছরে নির্দিষ্ট কিছু দিনে সীমাবদ্ধ। নিয়মিত পর্যটন অর্থনীতি গড়ে না ওঠায় স্থানীয় ব্যবসা ও কর্মসংস্থানও স্থায়ী রূপ পায়নি। এই বাস্তবতার আলোকে ভোটারদের প্রশ্ন বদলেছে। তারা জানতে চাইছেন— আগের প্রতিশ্রুতি কেন বাস্তবায়িত হয়নি, নতুন প্রতিশ্রুতির বাস্তব রূপরেখা কী এবং কোন সময়ে কত কর্মসংস্থান হবে। মুজিবনগরের ভোটারদের কাছে এবারের নির্বাচন তাই আবেগের নয়, জবাবদিহিতা ও সক্ষমতার পরীক্ষা। ইতিহাসের গৌরব নয়, তারা এখন চাইছে বাস্তব জীবনের নিরাপত্তা, কাজ, আয় ও সম্মানের নিশ্চয়তা।

যে প্রতিশ্রুতি পূরণ সম্ভব নয়, তা দেব না

ওই প্রতিশ্রুতি আমরা দেব না যেটা পালন করতে পারব না বলে জানিয়েছেন বিজিএমইএ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি এবং চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু। গতকাল বুধবার বেলা ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের ১০টি স্থানে পথসভা করেন তিনি। এসময় বাবু খান এ কথা বলেন।

মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, ওই প্রতিশ্রুতি আমরা দেব না যেটা পালন করতে পারব না। যেমন বেহেশতের টিকিট দেওয়া। এই প্রতিশ্রুতি আমরা দেব না। কারণ আমরা জানি, এখানে যারা নেতারা আছেন, আমিসহ আমার কর্মী-সমর্থক এবং আপনারাও অনেকেই জানেন এটা পালন করা সম্ভব না। আমরা ওই প্রতিশ্রুতি দেব না। আমরা কী প্রতিশ্রুতি দেব?… আপনার সন্তান লেখাপড়া শেষ করলে বেকার থাকবে না এই প্রতিশ্রুতি আমরা দেব। আমরা এই প্রতিশ্রুতি দেব যে এখানে অনেক দিন ধরে হাসপাতাল হওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে, তবে হয়নি। আপনাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী এখানে যাতে ৫০ শয্যার হাসপাতাল করা যায় সেই উদ্যোগ আমরা নেব। এছাড়া রাস্তা-ঘাট ও অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করব। আমরা কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়েও কাজ করব।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী আরও বলেন, যতগুলো কৃষি প্রধান জেলা আছে, তার মধ্যে চুয়াডাঙ্গা অন্যতম। এখানে শুধু ধান, পাট, ভুট্টা, আখ এসব সাধারণ ফসলই হয় না; হয় ব্যতিক্রমী ফসলও। ফুলের চাষ হয়, ফলের চাষ হয়। পেয়ারা তো আমাদের কাছে পুরোনো বিষয়। এখন কমলা, মাল্টা, ড্রাগন, স্ট্রবেরি এমনকি আঙুরেরও চাষ হচ্ছে। এটা সৃষ্টিশীল চিন্তাভাবনার ফল। অন্য কোনো জেলায় এভাবে হয় না। এটাকে আরও উন্নত করতে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি চুয়াডাঙ্গায় পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হবে। এসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হবে, উদ্যোগ নেওয়া হবে।

এসময় বিএনপির ৩১ দফার প্রসঙ্গ টেনে মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, বাংলাদেশের মানুষের যা যা প্রয়োজন সবই বিএনপির ৩১ দফার মধ্যে রয়েছে। ভবিষ্যতে যদি এমন কোনো প্রয়োজনীয় বিষয় আসে যা ৩১ দফার মধ্যে নেই সেটিও যোগ করা হবে। বিএনপি জনগণের কথা ভাবে। জনগণের কথা ভাবার কারণেই আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েও কখনো পিছিয়ে যাননি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা খাজা আবুল হাসনাত, সাধারণ সম্পাদক আহম্মদ আলী, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন, সিনিয়র সহসভাপতি আক্তার হোসেন, সহসভাপতি আব্দার আলী, দর্শনা থানা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলাম যুদ্ধ, সাংগঠনিক সম্পাদক মহিদুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক আসলাম উদ্দীন, বেগমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. আশাবুল হক, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম বাদশা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আজিজুল হক, বিএনপি নেতা মো. জিল্লুর রহমান প্রমুখ।

গাংনীতে প্রেমিকের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে জীবন দিল স্কুল

ছাত্রী

বাঁচতে হলে এক সাথে বাঁচবো,মরতে হলে এক সাথে মরবো এমন মরনপণ প্রতিজ্ঞা নিয়ে প্রেম করে বিয়ে না করাই প্রেমিকের প্ররোচনায় হারপিক পান করে একাই জীবন দিলো নবম শ্রেনীর স্কুল ছাত্রী সুম্মা খাতুন (১৫)।

দীর্ঘ আড়াই মাস জীবনের সাথে যুদ্ধ করে অবশেষে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মুত্যু হয় সুম্মার। সুম্মা গাংনী উপজেলার সহড়াতলা গ্রামের রেজাউল হকের কণ্যা ও হাড়াভাঙ্গা এইসএসকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেনীর ছাত্রী।

রবিবার সকালে সুম্মার মৃত্যু হলে বিকেলের দিকে মরদেহ গ্রামে এসে পৌঁছায়। সুম্মার মৃত্যুতে পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া।

পারিবারিক ও স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে, প্রবিবেশী সাইদুর রহমানের স্কুল পড়ুয়া ছেলে স্বাধীনের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে সুম্মার। কয়েক মাস যেতে না যেতেই সম্পর্কের কথা উভয় পরিবারের মধ্যে জানাজানি হয়। স্বাধীনের পরিবারকে বিয়ে প্রস্তাব দেয় সুম্মার পরিবার। বিয়ের বিষয়টি স্বাধীনের পরিবার প্রত্যাক্ষাণ করে।

সুম্মার সাথে কথা হয় স্বাধীনের। দুজনেই প্রতিজ্ঞা করে বিয়ে না হলে দুজনেই এক সাথে হারপিক পান করে প্রেমের ইতিহাস গড়বে। যে কথা সেই কাজ। স্বাধীনের পরিবার থেকে প্রেমে বাঁধা আর চাপাচাপিতে সুম্মা ও স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেয় একই সাথে আত্নহুতি দেয়ার। কথানুসারে গত ২২/৫/২০২২ ইং তারিখে বাথরুমে গিয়ে হারপিক পান করে সুম্মা।

আহত মূমূর্ষবস্থায় সুম্মাকে তার পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। সুম্মার অবস্থা অবনিত হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানে কিছুদিন চিকিৎসা নিয়ে অবস্থার আরো অবনতি হলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে কর্তব্যরত চিকিৎসক।

দীর্ঘ দুই মাস দশ দিন চিকিৎসাধীণ অবস্থায় ঢাকা শেখ রাসেল ন্যাশনাল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনিষ্টিটিউট এ্যান্ড হাসপাতালে চিকিসাধীন অবস্থায় রবিবার সকালে তার তার মৃত্যু হয়।

সুম্মার বড় বোন রুপালী খাতুন জানান, স্বাধীন আমার বোন সুম্মার সাথে প্রতারণা করেছে। তারা দুজনে এক সাথে মরার কথা বলে আমার বোন হারপিক পান করে আর স্বাধীন করেনি। স্বাধীন আমার বোনকে মুত্যুর প্ররোচণা না দিলে কখনো আমার বোন হারপিক পান করতো না। আমরা স্বাধীনের উপযুক্ত শাস্তি চাই। সুম্মা মৃত্যুর আগে একটি আত্নহত্যায় প্ররোচনা বিষয়ে একটি ভিডিও বার্তা রেকর্ড) দিয়ে যায়।

সুম্মার পিতা রেজাউল হক জানায়, আমার মেয়ের বিয়ের জন্য আমি একাধিকবার স্বাধীনের বাবার কাছে গিয়েছি। কিন্তুু স্বাধীনের বাবা মেনে নেয়নি। আমার মেয়েকে স্বাধীন মৃত্যু জন্য পত্রিজ্ঞা করেছে। কিন্তু আমার মেয়ে একাই সেই প্রতিজ্ঞা রাখতে গিয়ে আমার বুক খালি হয়েছে। দীর্ঘদিন চিকিৎসা করতে গিয়ে আমি পথের ফকির হয়ে গেছি তবুও আমার মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলামনা। একথা জানাতেই মুর্ছা যায় সুম্মার পিতা।

স্থানীয় ইউপি সদস্য শরিফুল ইসলাম নাটু জানান, প্রেমের সম্পর্কের কারনে মেয়েটি দুই মাস আগে হারপিক পান করেছিল। এতে তার পরিবারের বড় ধরনের ক্ষতি হলো।

তেঁতুলবাড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস জানান, আমি এঘটনা শুনেছি। গ্রামের মানুষও বিভিন্ন ভাবে মেয়েটিকে চিকিৎসার জন্য সহযোগীতা করেছে। কিন্তু যার জন্য মেয়েটি আত্নহত্যা করলো সেই পরিবারের লোকজন একটু সহযোগীতা বা সহানুভুতি দেখাইনি। এমন হৃদয় বিদারক ঘটনার আর অবতারন দেখতে চাইনা।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, এবিষয়ে আমার কাছে কেউ আসেনি। তবে অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।